"বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র।*

("সাহিত্য-সংহিতা" হইতে উদ্ধৃত)

কবি, দার্শনিক, আস্তিক, নাস্তিক সকলেরই মত এই যে, সংসার অনিত্য। সংসার যখন অনিত্য, তখন সংসারী মানুষ যে নিত্য হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানুষ দুই দিনের জন্য সংসারে আসে, আসিয়া রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় সংসারের খেলা খেলিয়া আবার চলিয়া যায়, সংসারে আর তাহার কোন চিহ্নই থাকে না। কিছুই কি থাকে না? একটী জিনিষ থাকে,—স্মৃতি। সে স্মৃতি কখন পুণ্যের সমুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া সৌম্যমধুর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শন করে, কখন বা পাপের ঘনকালিমায় আবৃত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিভীষিকার করাল মূর্ত্তিরূপে উপস্থিত হয়। অনিত্য সংসারে নশ্বর মানব-জীবনের ইহাই শেষ চিহ্ন। এ চিহ্ন অনশ্বর—অনন্তকালস্থায়ী। ইতিহাস এই চিহ্নটীকেই বক্ষে ধারণ করিয়া অনাদিকাল হইতে বলিয়া আসিতেছে,—"মানুষ! তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পার যদি, আমার বুকে একটু দাগ রাখিয়া যাইও, তুমি নশ্বর জীবনে অবিনশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

মানুষ যায়, স্মৃতি থাকে। সকলের থাকে না; যে ভীরু মানব জীবন-সংগ্রামের ভীষণতা-দর্শনে পশ্চাৎপদ হইয়া আপনাকে অদৃষ্টের

---

* 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রথম স্মৃতি-সভায় "সাহিত্য-সংহিতা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, সংসার তাহার স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারে না, তাহা আপনা হইতেই মুছিয়া যায়। কিন্তু যে বীর পুরুষ কঠোর জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহায়তায় একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, শত প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও আপনাকে স্থির রাখিয়া কর্ত্তব্যের কঠোর অনুশাসন মাথা পাতিয়া লইতে পারে, সংসার আদর করিয়া তাহার স্মৃতি অনন্তকালের জন্য স্বীয় বক্ষে অঙ্কিত করিয়া রাখে; প্রলয়ের মহাপ্লাবনেও সে স্মৃতি মুছিয়া যায় না। এইরূপ কত মহাপুরুষের স্মৃতি-চিত্র আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যৎ মানবগণের হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। এইরূপ একটী মহাপুরুষের চরিত্র-চিত্রের কিয়দংশ প্রদর্শন জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অধুনা এই ভূমণ্ডলে এমন কে আছেন, যিনি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র, সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষী, বিদ্বান্, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান্, অসূয়াশূন্য, এবং সমরক্ষেত্রে কাহার ক্রোধ দর্শনে সুরগণ শঙ্কিত হইয় থাকেন? এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ সেই রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রের বিভূতি বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিভূতি-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্র বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া আজিও হিন্দুর গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন। কিন্তু এখন যদি কেহ ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তবে তাহার উত্তর দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, ঐরূপ বহুগুণসম্পন্ন মানুষ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। একেবারেই কি দেখিতে পাওয়া যায় না? দেখিতে পাওয়া যায়, তবে, তিনি ঐরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন না হইলেও বহুগুণ সম্পন্ন বটে। এখন যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কোন কোন কথার

কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা কোন কোন বিভূতিকে বাদ দিয়া বা তাহাদের মাত্রা কমাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি অসংকোচে বলিতে পারি, এখনও ঐরূপ মানুষ ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। তিনি কে? তিনি বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

আমার বা আর কাহারও ভালবাসায় দৃষ্টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র 'প্রিয়-দর্শন' হইলেও অনেক নিরপেক্ষ সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তিনি প্রিয়দর্শন হইতে পারেন না। তবে যাঁহারা কখন তাঁহাকে চোখে দেখেন নাই, কেবল তাঁহার সাহিত্য-শক্তি ও কর্ম্মাবলীর মধ্য দিয়া মানস-নেত্রে তাঁহার কল্পিত সৌম্যমধুর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট যোগেন্দ্রচন্দ্র নিশ্চয়ই প্রিয়দর্শন বলিয়া প্রতিভাত হইবেন। সুতরং উক্ত বিশেষণটী বাদ না দিলেও আমরা বোধ হয় বিশেষ অপরাধী হইব না। আর এক কথা, যোগেন্দ্রচন্দ্র যে কখন কোন সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধের বিকট প্রকটনে অরাতিকুলকে ভীত করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায় নাই। তবে যদি সংসার-সংগ্রামকে প্রকৃত সংগ্রাম বলিয়া ধরা যায়, আর তাহার অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়াকে প্রকৃত বীরত্ব বলা যায়, তবে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে এই সংগ্রামবিজয়ী বীর বলা যাইতে পারে। ফল কথা, যোগেন্দ্রচন্দ্র বহু গুণে গুণবান্ ছিলেন; তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, সংযতচিত্ত; তিনি সচ্চরিত্র, সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষী, দৃঢ়ব্রত; তিনি সর্ব্ববিষয়দক্ষ, বিদ্বান্ ও জিতক্রোধ ছিলেন।

মাসাধিক কাল পূর্ব্বে আমি যদি যোগেন্দ্রচন্দ্রের এইরূপ গুণ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতাম, তবে হয় তো অনেকেই মনে করিতেন যে, আমি বর্ণনায় অতিরিক্ত পরিমাণে অতিশয়োক্তির খাদ মিশাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ আমাকে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

স্তাবক বলিয়া মনে করিতেন, তবে তাহাতেও আমার বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আজি আর সেদিন নাই। আজি যোগেন্দ্রচন্দ্র আর ইহলোকে নাই, তিনি এখন ইহলোকের পরপারে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গবাসী তাঁহাকে যেমন চিনিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণত্ব যেমন অনুভব করিতেছেন, তাঁহার জীবিতকালে অনেকেই তাঁহাকে সেরূপ চিনিতেন না, সেরূপে বুঝিতেন না, বা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না। যেমন বায়স্কোপের চিত্রকে দূর হইতে না দেখিলে তাহার সম্যক্ সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, তেমনই নিকটে থাকিতে অনেক মহাপুরুষের অসাধারণত্ব বোধগম্য হয় না। তাঁহারা যখন সংসার ত্যাগ করিয়া অতিদূরে—ইহলোকের পরপারে গিয়া দণ্ডায়মান হন, তখনই তাঁহাদের চরিত্র-চিত্র সম্যক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখনই আমরা তাঁহাদের লোকাতীত মহত্ত্ব-দর্শনে বিমুগ্ধ হই, তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে আমরা অন্তরের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। মরণেই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রকে না চিনিবার আরও কারণ ছিল। তিনি অনেক সময় আত্মগুপ্তির আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতেন। তাঁহার সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বাহিরে বাহিরে তাঁহার চরিত্র সৌন্দর্য্যের যাহা কিছু অনুভূতি হইত, কিন্তু তাঁহার ভিতরে যে কি সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা কে বুঝিত? প্রভাতের অরুণ-কিরণ-সম্পাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার বাহিরে যে কনক-কান্তি ফুটিয়া উঠে, তাহার অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি হইতে দিবারাত্র কিরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কেননা, কাঞ্চনজঙ্ঘা দুরধিগম্য, দুরারোহ। যোগেন্দ্রচন্দ্র নিত্য নিভৃত নিলয়ে বাণীর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন, বাহিরে অনেক লোকেরই তাঁহাকে দেখিবার বা বুঝিবার সুযোগ ঘটিত না। মাৎসর্য্যবর্জ্জিত ধনকুবেরের গৃহে কত পেটিকা কত ধন-

রত্নে পরিপূর্ণ, তাহা তিনি বাঁচিয়া থাকিতে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার জীবনান্তে লোকে যখন তাঁহার গৃহ অনু-সন্ধান করিতে থাকে, তখন তাঁহার চিরসঞ্চিত বিত্তবরাশি দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা তাঁহার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাহিত্যে সংসারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রকৃতই যোগেন্দ্রচন্দ্র অসাধারণ। তিনি অসাধারণ কর্ম্মী, অসাধারণ সাহিত্য-সেবী। পুরুষকারের প্রভাবে এবং অদৃষ্টের সহায়তায় তিনি সকল কর্ম্মেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কর্ম্মের সাফল্যে আজ বঙ্গ-সমাজে তাঁহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সে প্রতিষ্ঠার সহস্র দৃষ্টান্তএখন প্রকটিত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, 'সাহিত্য-সম্মিলন' সাহিত্যেরই পরিপোষক। বঙ্গ-সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রভাব কিরূপ, তাহাই দেখিবার বা বুঝাই-বার ভার আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছে। আমি সাহিত্যে অকৃতী হইলেও, তাঁহার সাহিত্য-প্রতিষ্ঠার যে একটা পরিচয় পাইয়াছি, তাহা এখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে অব্যক্ত। অবশ্য তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখনও কেহ সে প্রতিষ্ঠার উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হন নাই। তিনি স্বয়ং সাহিত্যসেবী ছিলেন, একথা সকলেই জানেন, কিন্তু তিনি সাহিত্যসেবীর কিরূপ সেবা করিতেন, তাহার পরিচয় বোধ হয় অনেকেই পান নাই। সে পরিচয় পাইলে, বঙ্গ-সাহিত্যে সাহিত্যসেবীর সেবায় যোগেন্দ্রচন্দ্র যে পূর্ণাদর্শ, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। নদীয়ার চৈতন্য প্রেমিক ছিলেন, তিনি প্রেমিকের পূজা করিতেন, প্রেমিকের পদরজে গড়া-গড়ি দিতেন। বর্দ্ধমান বেড়ুগ্রামের যোগেন্দ্রচন্দ্র সাহিত্যসেবী ছিলেন, তিনি সাহিত্যসেবীর পূজা করিতেন, সাহিত্যসেবী পাইলেই

তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতেন। এ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, বঙ্গে আর কোন সাহিত্যসেবীই বুঝি তেমন করিতে পারেন নাই। "বঙ্গবাসী" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গের বহু শক্তিশালী সাহিত্যসেবীর সেবা করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মূলধন 'বঙ্গবাসীর' প্রতিষ্ঠা সংবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে কিনা, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহারা শক্তিশালী লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, এমন কি "বঙ্গদর্শনে"র অনেক কৃতী লেখক পর্য্যন্ত "বঙ্গবাসী"তে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। আর যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের সেবা করিয়া, তাঁহাদের অনেকেরই চরণে প্রণামী দিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া প্রণামী দিয়া আর কেহ সাহিত্যসেবিগণের সেবা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কেহ কেহ ভালবাসার খাতিরে "বঙ্গবাসী"তে লিখিতেন, বটে, এবং তাঁহারা প্রণামীর প্রত্যাশা করিতেন না; কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রকারান্তরে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। ভক্তের বিশ্বাস, প্রণামী না দিয়া দেবদর্শন করিতে নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্রেরও বিশ্বাস, প্রণামী না দিয়া সাহিত্যসেবিগণকে পরিশ্রম করাইতে নাই। এখন হয়ত অনেকেই মিতব্যয়িতার অনুরোধে সর্ব্বাগ্রে দেবদর্শনের প্রণামী বন্ধ করিয়া অর্থনীতির সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র এ নীতির বড় একটা ধার ধারিতেন না।

চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রেরও উদারতা ও বিনয়-নম্রতার এমন একটী মধুর আকর্ষণ ছিল যে, যিনি একবার তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন, তিনি আর তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না। "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠা হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি বহু সাহিত্যসেবীরই

এইরূপে সম্মান রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। কি "বঙ্গবাসী" কি "জন্মভূমি," কি "হিন্দি বঙ্গবাসী," কি "টেলিগ্রাফ"—সকলের সম্বন্ধেই সাহিত্যসেবীর সম্মান-রক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই সাহিত্য-সেবায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের অনুগত-প্রতিপালনের প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়।

'বঙ্গবাসীর' বেতনভোগী লেখকও 'জন্মভূমি'তে লিখিয়া স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন। কেহ কেহ হয়তো এইরূপ সাহিত্য-সেবার উপর স্বার্থপরতার আরোপ করিয়া বলিতে পারেন, তিনি তাঁহাদিগের নিকট সেবা পাইতেন, তাই সেবা করিতেন, ইহা নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবা নহে, ব্যবসায়ের বিনিময় মাত্র। কিন্তু আমরা জানি, কোন কোন দুঃস্থ সাহিত্যসেবী যোগেন্দ্রচন্দ্রকে কোনরূপে সাহায্য করিবার সুযোগ না পাইলেও, পরদুঃখকাতর যোগেন্দ্রচন্দ্র উপযাচক হইয়া তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। 'বঙ্গবাসী'তে লিখাইয়া লইবার জন্য তিনি কোন কোন লেখককে এককালীন অনেক টাকা অগ্রিম দিয়া রাখিতেন; আমরা জানি, কোন কোন লেখক অগ্রিম টাকা লইয়াও কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু সে জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্রকে সেই লেখকের চরিত্র সম্বন্ধে কখনও কোন অনুযোগ করিতে কেহ শুনে নাই। তিনি 'জন্মভূমি'তে উপন্যাস লিখিবার জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রও ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যোগেন্দ্র-চন্দ্রের আশা ফলবতী না হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

সাহিত্য-সরোবরের স্ফুট-কোরক-কমল-কাননে কমলাসনা ভার-তীর চরণচুম্বী মধুকরনিকর যে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করে, বীণাপাণির সপ্তস্বরসংবাদিনী বীণার কোমল ঝঙ্কারে যে সুবিমল সুধারাশি অজস্রধারে ক্ষরিত হইয়া বিশ্ব আমোদিত—প্লাবিত করে,

যোগেন্দ্রচন্দ্র নিভৃত নিলয়ে বসিয়া মাতৃপদধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, সেই মধু—সেই সুধা সঞ্চয় করিতেন। আর তাঁহারই মত মাতৃপদসাধক-গণের সাহচর্য্যে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট যে মধু পাইতেন, তাহা লিপি-কমলপত্রে বঙ্গের গৃহে গৃহে ছড়াইয়া দিতেন। আজ সেই মধুর—সেই সুধার—সুমধুর আস্বাদনে বঙ্গবাসী বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যসেবার আর একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় এখনও দেওয়া হয় নাই। তাহা পুরুষকার। যে উপকরণে পুরুষকারের পূর্ণতা, সেই উপকরণেই তাঁহার 'বঙ্গবাসী', 'জন্মভূমি', 'হিন্দি বঙ্গবাসী' ও শাস্ত্র প্রকাশ সৃষ্ট ও পুষ্ট; আবার সেই উপকরণেই ইংরাজী দৈনিকপত্র 'টেলিগ্রাফ' সংগঠিত ও সংবর্দ্ধিত। সে উপকরণ কি? একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও অকপটতা। 'টেলিগ্রাফ' প্রকাশিত হইবার দুই এক মাস পরেই তিনি বুঝিলেন যে, 'টেলিগ্রাফ' ঠিক তাঁহার মনের মত সম্পাদিত হইতেছে না, ঠিক তাঁহার মতের পরিপোষক হইতেছে না। তিনি নিজে 'টেলিগ্রাফ' লিখিতেন না। ইংরাজী লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি ইংরাজী পড়িতেন, কিন্তু লিখিতেন না। তাঁহার মুখে কখনও ইংরাজী জ্ঞানের গন্ধ শুনি নাই। 'টেলিগ্রাফ' মনের মত সম্পাদিত হইতেছে না দেখিয়া তিনি বড় ব্যথিত হইলেন; এই ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে এক কঠোর প্রতিজ্ঞা জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি—'টেলিগ্রাফে' লিখিব, আমারই মত করিয়া, আমারই মত বজায় রাখিয়া 'টেলিগ্রাফে' লিখিব।" যে কাল-রোগে যোগেন্দ্রচন্দ্রের জীবনান্ত হইয়াছে, ঠিক এই সময়েই সেই রোগের বীজ তাঁহার বিরাট দেহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ভিতরে ভিতরে একটু একটু জ্বর হইতেছিল। দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল। ভিতরে

যে আগুন জ্বলিতেছিল, বাহিরে তাহার কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। দুই মাস কাল প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি ইংরাজী সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমে অবিচল উৎসাহ-সহকারে পড়িতে লাগিলেন। 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত তাঁহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। সেই সময়েও তিনি অনেক ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফলে দুই মাস পরেই তিনি 'টেলিগ্রাফ' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে রুষ-জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই রুষ-জাপানযুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি 'টেলিগ্রাফে' অনেক গুলি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। 'টেলিগ্রাফে' সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর, চারিদিক্ হইতে ইহার প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। বাস্তবিক রুষ-জাপান-যুদ্ধ সম্বন্ধে সেই যে কয়েকটী প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তেমন প্রবন্ধ অনেক খ্যাতনামা ইংরাজী সংবাদপত্রেও বড় বেশী দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের ইংরাজী লিপিপটুতায় সেই সকল প্রবন্ধ যে সর্ব্ব-জন-মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল, এমন কথা বলিতেছি না। তবে, তাঁহার বাঙ্গালার ভাষাভঙ্গী যেরূপ সরল, সহজ এবং সুখপাঠ্য, ইংরাজীর ভাষাভঙ্গীতেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয় বিশ্লেষণে, যুক্তি-তর্কের অবতারণায়, রসমাধুর্য্যে তিনি 'টেলিগ্রাফে'র প্রবন্ধনিচয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা সে শক্তি প্রকৃতই দুর্লভ। কেবল রুষ-জাপানের যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্যান্য বিষয়েও তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্বভাবজ রস-রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বিষম গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, যোগেন্দ্রচন্দ্র সে সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র অনুবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা জানি, সেই অনুবন্ধটী ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র 'সিভিল

মিলিটারি "গেজেটে" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার অনেক প্রবন্ধই অনেক ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হইতে দেখিতাম। যখন তিনি দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য সুদূর হাজারিবাগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি সেই রুগ্ন ভগ্ন দেহে 'টেলিগ্রাফে'র জন্য নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব নির্ব্বাসিত রাজা কুলচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা 'টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত হইয়াছিল। রুগ্ন-মস্তিষ্ক-প্রসূত কারুণ্যরসপূর্ণ সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কোন পাঠক যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।

এরূপ কঠোর পরিশ্রমের ফলে যোগেন্দ্রচন্দ্র ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার 'টেলিগ্রাফ'কে ভুলিতে পারিলেন না। দেহান্তের কয়েকদিন পূর্ব্বেও তিনি মধুপুর হইতে 'টেলিগ্রাফে'র জন্য প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া টেলিগ্রাফে'র জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা যথাযথরূপে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধন্য প্রতিজ্ঞা! ধন্য উৎসাহ! ধন্য অধ্যবসায়! তাঁহার "বঙ্গবাসী", তাঁহার "জন্মভূমি", তাঁহার 'হিন্দি বঙ্গবাসী', তাঁহার শাস্ত্র প্রকাশ, এ সকলের জন্যই তিনি এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ অধ্যবসায়, এইরূপ একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এক 'টেলিগ্রাফে'র নিদর্শনেই বুঝা যায় যে, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রতিজ্ঞায় যেমন অটল, তেজে তেমনই অপরাজেয়, উৎসাহে তেমনই অবিচল। বিদায়োন্মুখ বসন্ত যেমন লতায় পাতায়, ফলে ফুলে, পল্লবে পাদপে পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া একেবারে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলে, তেমনই ইহলোক হইতে বিদায় লইবার

পূর্ব্বে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিভা জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কাব্যে দর্শনে, সংযমে সাহসে সমগ্র শক্তি বিস্তার করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হায়, ইহা যে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ দীপ্তি!

কর্ম্মবীর যোগেন্দ্রচন্দ্র কেবল যে 'টেলিগ্রাফে'র চিন্তাতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহার উপর সহস্র দিক্ হইতে সহস্র প্রকার চিন্তা আসিয়া তাঁহার রোগ-জীর্ণ-হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়াছিল; এইরূপ সহস্র কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রমেও কখনও তাঁহার মুখ হইতে অবসাদের বাণী শুনা যায় নাই, একদিনের জন্যও ক্লান্তি আসিয়া তাঁহাকে এই বিশাল সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। ভগ্ন রুগ্ন দেহে সহস্র চিন্তার সহিত অজস্র সংগ্রামে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, জীবনতন্ত্রী ছিন্ন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি যোগেন্দ্রচন্দ্র স্থির, নির্ভীক, অটল। মানসিক তেজই এই সকল বাধাবিঘ্নকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে এরূপে স্থির রাখিয়াছিল, এরূপে তাঁহার ললাটে বিজয় তিলক পরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মানবদেহে তো পাষাণ নয়? মানব-হৃদয় তো লৌহনির্ম্মিত নয়? সুতরাং তাহাতে আর কত সহিবে? আর সহিলও না; কালনিক্ষিপ্ত অমোঘ শক্তিশেলের নিদারুণ প্রহারে তাঁহার জীবনতন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল।

বঙ্গসাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের কিরূপ প্রভাব, কিরূপ অধিকার, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থান কোথায়, ইহা বুঝিতে হইলে তাঁহার লিখিত খণ্ড প্রবন্ধাদি বা গ্রন্থসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু সে অবসর নাই, আলোচনা করিবার শক্তিও আমার নাই। অবসর বা শক্তি থাকিলেও শ্রোতৃবৃন্দের ততদূর ধৈর্য্যধারণের ক্ষমতা আছে কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ। তবে সংক্ষেপে অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর আলোচনা সম্ভব, তদ্দ্বারাই যোগেন্দ্রচন্দ্রের

সাহিত্যের প্রভাব, অধিকার ও স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই একটা কথা বলিতে হয়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিভঙ্গীতে যেমন তাঁহারই নিজত্বের পূর্ণ পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিপ্রণালী যেমন বঙ্গসাহিত্যে এক নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে, যোগেন্দ্রচন্দ্রের লিপি-ভঙ্গীতেও তেমনই একটা নিজত্বের—একটা নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ ভাষা, এরূপ ভাব, এরূপ ভঙ্গী যেন তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের, ইহার জন্য যেন তাঁহাকে কাহারও নিকট হাত পাতিতে হয় নাই। তিনি প্রথমে যখন 'সাধারণী'তে লিখিতে আরম্ভ করেন, তখনই তাঁহার লেখার ভঙ্গীতে কেমন একটা নূতনত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে নূতনত্ব দেখিয়া 'সাধারণী'র পাঠকবর্গ ভাবিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নূতন সুর নূতন ভাব লইয়া আবার কে নূতন গায়ক অবতীর্ণ হইলেন? মতিরায়ের যাত্রার আসরে এ কোন্ কীর্ত্তনীয়া মৃদঙ্গের মৃদুবোলের সহিত মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তনের মধুর পদ ধরিল? বাস্তবিকই যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখার এমনই একটা মধুরতা, এমনই একটা নূতনত্বের আভাস পাওয়া যায়। সে লেখার ভিতর সাধু ভাষা আছে, গ্রাম্য কথাও আছে; গাম্ভীর্য্য আছে, পরিহাসও আছে; বৌবাজারের ভীমময়রার দোকানের কড়া পাকের মনোহরা আছে, আর রামামুদীর দোকানের কলসীর গুড়টুকুও আছে। এই উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার ভাষা-স্রোত যখন একটা সরল সৌন্দর্য্যের নবীন তরঙ্গ তুলিয়া তরতর বেগে বহিয়া যায়, তখন সেই সঙ্গে পাঠকের চিত্তও তালে তালে নাচিয়া উঠে, কি যেন এক মোহমদিরায় তাঁহাদের চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রত্যেক গ্রন্থেই তাহার নিদর্শন পাওয়া

যায়। স্থান নাই, সময়ও নাই, নতুবা প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিতাম। তবে, আভাসে বুঝাইবার জন্য তাঁহার "মডেল ভগিনী"র এক স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"জ্যৈষ্ঠমাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করতেছে। বাবুর বাগানে দাড়িম্ব পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস নির্গুণ, নিশ্চলভাবে পরমব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে, কমল-সরোবরে তপনসোহাগে তৃপ্ত হইয়া কমলিনীকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখী প্রাণবঁধু জীবনধন জলকে 'ফটী ঈক জল' বলিয়া ডাকিতেছে। ওদিকে তারকেশ্বরের মোহান্তের হাতীটা অতিগরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া জলে পড়িয়া কমলদলের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে বঙ্গভূমি চমকিত।

"আরও কথা আছে। অতি গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল, চুল পাকিবে না? হাতী ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল—বারিপতন হইবে না কেন?

"কলিকাতার দালানগুলায় যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর ত আগুনের খাপরা। টিনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা-তাঁহা করিতেছে। নূতন চূণকাম করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া গরীব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়ী-গুলায় হলদে রং, সেগুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে। তজ্জাচপা অসূর্য্যম্পশ্য নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়ীতে আজকাল একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, সেইখানেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ-শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।"

কি সুন্দর বর্ণনা! কি মধুর ভাষার লালিত্য! এইটুকুর ভিতর সাধুভাষাও আছে, গ্রাম্য কথাও আছে; সংস্কৃত শব্দ আছে, দেশজ শব্দও আছে, সবই আছে। কিন্তু কেমন সহজ সরল সরস লিপিভঙ্গী! ভাষা যেন ছন্দের তরঙ্গে তালে তালে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। বর্ণনায় কেমন নূতন সরস ভাব। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ভাষাভঙ্গী সর্ব্বত্রই এইরূপ। যেন হারমনিয়মের বাঁধা সুর। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, সাতটী সুরই বাঁধা। যখন যে সুরই ধরুন না, ইচ্ছামাত্রে লয় ঠিক রাখিয়া সুর চড়াইতে ও নামাইতে পারেন। কড়ি কোমলে তাঁহার সাধা বিদ্যা। রুচির বিচারে 'মডেল ভগিনী' সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষা-ভঙ্গীর নিজস্ব ও নূতনত্ব সম্বন্ধে মতভেদ নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেকের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য থাকিলেও, তাঁহার ভাষার মাধুর্য্য সর্ব্বসম্মত। তাঁহার ভাষা সরল সহজ, সরস, সর্ব্বজন-বোধ্য, যেন খাঁটী নির্জ্জল পদ্মমধু। যেখানে যেমনটী চাই, তিনি সেইখানে ঠিক তেমনটী ধরিতেন; তিনি খেমটায় ঢোলক এবং ধামারে পাখোয়াজ ধরিতেন; তাঁহার সাধা সুর কখন তানপুরার গম্ভীর তানে বাজিত, কখন বা গ্রাম্যকৃষকের বাঁশের বাঁশীর ভিতর দিয়া বাহির হইত। তাই সে সুরে সকলের মন মুগ্ধ হইয়া পড়িত। তাঁহার বিষয়ে বৈচিত্র্য, ভাষায় বৈচিত্র্য, ভাবে বৈচিত্র্য, রসে বৈচিত্র্য; তাঁহার ব্যঙ্গে রঙ্গের অবিশ্রাম প্রবাহ, শ্লেষে ক্ষুরধার কুঠার বল্লম, গাম্ভীর্য্যে গিরিসার।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'নেড়া হরিদাস' ব্যঙ্গপ্রধান গ্রন্থ। ব্যঙ্গে ভণ্ডের ভণ্ডামি সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত। ইহাতে ব্যঙ্গের ভাষায় যেমন রঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়াছে, তেমনই আবার গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যও

প্রকটিত হইয়াছে। মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে—শ্লেষের কঠোর কশাঘাতে মর্ম্মের হাড় পর্য্যন্ত মড় মড় ভাঙ্গিয়া যায়। যেখানে ব্যঙ্গ, সেইখানে শ্লেষ, সেইখানেই যোগেন্দ্রচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁহার লেখা যে, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়, তাহা তাঁহার "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরি এবং বারাণসীর কৃষ্ণানন্দের মোকদ্দমা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলিতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যোগেন্দ্রচন্দ্র রসভঙ্গীতে কিরূপ ব্যঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলিতে পারেন, শ্লেষের কিরূপ তীব্র তীর ছুটাইতে পারেন, তাহা তাঁহার "চিনিবাস-চরিতামৃত' ও 'বাঙ্গালী চরিতে' পূর্ণ প্রতিভাত। 'বাঙ্গালী-চরিতে'র গদাধরচন্দ্র চিনিবাসের দ্বিতীয় দোসর। গদাধরচন্দ্র চিনিবাসের ন্যায় বক্তৃতার ডম্বরু-নিনাদে জননী জন্মভূমি ভারতের উদ্ধারপ্রয়াসী। গদাধর ও চিনিবাসের ন্যায় তাহাতে চিন্তামগ্ন। 'বাঙ্গালীচরিত' হইতে গদাই-চরিতের একটু আভাস লউন;—

"একদিন প্রাতঃকালে সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া গদাই নিবিষ্টচিত্তে কি গভীর ভাব ভাবিতেছেন, তাহা কেহ জানে না; মলয়-মারুত-আন্দোলিত নলিনীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে দুলিতেছেন, আর অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলিতেছেন,—'সব ঠিক, কেবল চীনে একজন দূত পাঠাই-লেই হয়—উপযুক্ত পাত্র কে? পাত্রের মধ্যে আমি আর মিষ্টান্ন গোবর্দ্ধন। কিন্তু আমরা গেলে চলে কই? তবে কি কামস্কটক্কা রেলপথ হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে।' গদাই ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ভাবসাগরে ডুবিয়া গেলেন। ক্রমে একটু উচ্চস্বরে বলিলেন;—

একা আমি এ সংসারে কোন্ দিক্ রাখি,
দুই হাত, দুই পদ, দুই নাসাপুট,—
দুটীর অধিক মোর নাই কর্ণছিদ্র;
হায়রে নাহিক জিহ্বা একের অধিক,—

সামান্য সম্বলে বল কেমনে পশিব
কামস্কট্‌কা ভূমি ; হায় মোর কি যন্ত্রণা ;
কেন না হইল মোর দু'টো রসনা,
চারি চক্ষু, চারি হস্ত চারিটী চরণ।
তা হলে কি আজ আমি ভাবিতাম এত ?
দুই চোক পাঠাতাম চীন-উপকূলে,
একটী রসনা যেত লয়ে দুটি হাত
(বক্তৃতাকারে নাড়িবার হেতু চীনদেশে)
এতক্ষণ চীনরাজ কাঁপিত সভয়ে—
পায়ে ধরি ভাব করি দিত ভূমি ছাড়ি ;
চলিত বাষ্পীয় যান গভীর গর্জনে
ঘোর রবে ঘর্ঘরিয়া ঘুরিয়া উঠিত
গিরিশৃঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে মাতঙ্গ যেমতি
ধায় মাতঙ্গিনী-পিছে পর্ব্বত-উপরি।
কিন্তু একা আমি ; যোড়া যোড়া নাই বস্তু
কি করিতে পারি ? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অসি ধরি করে উপাড়িয়া ডান চক্ষু,
চিরিয়া রসনা, ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু
ফেলি চৈনিক প্রাচীরে।

এমন সময় একটী লোক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরিল ; গদাই বলিলেন ;—

কে তুমি হে ? মিষ্টার মিত্রজ নাকি ?
চক্ষু চাপি কিবা ফল, ছাড় দু'নয়ন ;—
জ্ঞান-চক্ষে ধূলি দেয় কাহার শকাত ?

পার্থিব নয়ন ঢাক মোরে কি ভুলাবে ?
চক্ষু বুজি সব দেখি আমি গদাধর।

তখনও তিনি চক্ষু ছাড়িলেন না ; গদাই আবার বলিলেন,—

চক্ষু ছাড় গোবর্দ্ধন-মিত্রজনন্দন !
নয়নরতন আজ বড় মূল্যবান্ ;
ডান চক্ষু যাবে আজ চীনের মুলুকে,
বাম আঁখি রবে গৃহে গৃহ করি আলো।

সেই লোকটী তখন চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল ; গদাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এ কি ?

নিবাস কোথায় তব ? ঘর কোন্ দেশে ?
কভু তুমি নহ বঙ্গে মিষ্টার গোবর ;
বঙ্গভূমি জন্মভূমি নহেরে তোমার ;
জাতীয় লক্ষণ নাই তোমার শরীরে।
হ্যাট কোট কই তব ? গলায় কলার কৈ ?
একি ! বস্ত্র পরিধান ? লাজে মরি দেখে
ফিং ফিংে কানি—নীচে তার কাল ডোরা,
উপরে উলঙ্গ অঙ্গ—রঙ্গ ভঙ্গ দেখি
শিহরে আতঙ্কে অঙ্গ মোর ; হায় বিধি !
কি মাটীতে গড়েছিলে এ নরমুরতি ?

লোকটীর নাম হরিদাস। হরিদাস গদাইয়ের নিকট টাকা পাইত। গদাই হরিদাসকে চিনিতে পারিলেন না। হরিদাস বলিল, ভাল, গদাই, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ? তখনই

উত্তরিল গদাধর ক্রোধে কম্প দেহ—
কে তুমি হে কৃষ্ণকায় ? ভোমরা ভরম
হয় দেখি তব দেহ ; কুকণ্ঠে উগার

কেন কালপেঁচা সম কিচকিচে ধ্বনি ;
(এবে) অনেক সাঙ্গাত আসে সখা সখা বলি
আলাপিতে মোর সনে এ ঐশ্বর্য্য কালে।
ভাই বল, খুড়া বল, বাবাই বা বল
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয়।

ইহা সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র। যোগেন্দ্রচন্দ্র উৎপ্রেক্ষায় ব্যঙ্গের রঙ্গে, তীব্র ভাবভঙ্গে, সমাজের একটী স্বভাবজ সুন্দর চিত্র আঁকিয়া সমাজের চক্ষে ধরিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কননৈপুণ্যে এই ব্যষ্টি চরিত্রে সমাজের একটী সমষ্টি-চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই ব্যঙ্গলেখকের সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ পরিচয়।

ব্যঙ্গ-বর্ণনায় কিরূপ রসনর্ত্তনে যোগেন্দ্রচন্দ্র মন মজাইতে পারেন, 'নেড়া হরিদাস' হইতে তাহারও একটু নমুনা তুলিয়া দেখাইতেছি ;—

"গঙ্গার ধারে দিব্য দ্বিতল বাড়ীটী। বৈকালে দ্বিতলের বারাণ্ডায় বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া থাকিলে স্বর্গসুখ সম্ভোগ হয়। অট্টালিকাটী প্রকাণ্ড। মেরামত বোধ হয় অনেক দিন হয় নাই। বাহিরের সাদা চূণকাম কতকটা কালো হইয়াছে। খড়খড়ির পাখী, দুই চারিটা ভাঙ্গিয়াছে। পুরাতনত্ব হেতু বাড়ীটীর প্রকাণ্ডত্ব যেন বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বারে দুই জন দ্বারবান্ উপবিষ্ট। ইহা ব্যতীত দাস আছে, দাসী আছে—তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী আছেন—সোহাগিনী সহচরী আছেন—ক্ষীর-সর-নবনীত-বণ্টনকারিণী গরবিণী গোয়ালিনী আছেন ;—ফুলমালাবিলাসিনী মনোমোহিনী মালিনী-মাসী আছেন ;—আর আছেন,—সেই মহিলাকুল-মনমজায়িনী মহামহোপাধ্যায়-উপাধিধারিণী লবঙ্গমঞ্জরী নাপিতিনী। আছেন সবই, নাই কেবল একটি,—অথবা কিছুই নাই। নীলাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র,—নাই

কেবল চন্দ্র। ব্যঞ্জন অসংখ্য—নাই কেবল ভাত। হাতে ফেরাই অনেক—নাই কেবল রঙ।”

দেখিতে পাই, যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের স্থানে স্থানে এক একটি বাক্যে বহু ভাবের রসগাম্ভীর্য্য, যেন মধুমিশ্রিত মর্দ্দিত রসসিন্দুর-কষিত কনক-সৌন্দর্য্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজলক্ষ্মীর একটি কথা এখানে উদ্ধরণযোগ্য।

কাত্যায়নী হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ রমণী, সাধ্বী পতিব্রতা। তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী ধনী ছলেন। এখন অবস্থাহীন। পূর্ব্বাবস্থার বর্ণনায় যোগেন্দ্রচন্দ্র এক স্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন;—“সমৃদ্ধির সময় কাত্যায়নীর স্বামীর সুন্দর উদ্যান ছিল। এখন এই হীনাবস্থায় তাহার তুরবস্থা হইয়াছে। এখন আর দেবীপূজার ফুল-গাছ ভিন্ন অন্য কোন ফুলগাছ বা অন্য কোন গাছই নাই। আছে কেবল একটী আম গাছ। ৺কর্ত্তা মহাশয় স্বহস্তে তাহা রোপণ করেন। প্রবাদ, সেরূপ সুমিষ্ট আম সে দেশে ছিল না। কর্ত্তা স্বয়ং জাসতি করিয়া সে আম পাড়িতেন, পাকাইতেন, দেবতাকে ও ব্রাহ্মণকে দিতেন। অবশেষে স্বীয় সহধর্ম্মিণী কাত্যায়নীকে বলিতেন,—আম সকলকে দেওয়া হইয়াছে, এখন তুমি একটি খাইলেই আমি খাইতে পারি। কাত্যায়নী হাসিয়া বলিতেন—ও আম টক, প্রসাদ না হইলে মিষ্ট হয় না, আমি টক আম কেন খাইব?” একজন ভাল ফটোগ্রাফার কাহারও চেহারা তুলিলে বড় আকারের ফটোতে যেমন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট করিয়া তুলে, ছোট আকারের ফটোতেও সেই চেহারার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেমনই প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে পারে। সমগ্র রাজলক্ষ্মী গ্রন্থ কাত্যায়নী-চরিত্রের বিরাট ফটো; কিন্তু “ও আম টক, প্রসাদ না হইলে মিষ্ট হয় না” এই কথা কয়টীতেও কাত্যায়নী-চরিত্রের পূর্ণ ফটো উঠি-

য়াছে। এই কথা কয়টীতেই প্রমাণ হইল, রমণী সাধ্বী, রমণী রসিকা। তাঁহার রসিকতা প্রগাঢ় রস-সিন্ধু, সরোবরের তরতর সলিল নহে। এই রসিকতায় রসভাষায় প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা সংযম—হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ রমণীর সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র আপনাকে দেখাইতেন না, কিন্তু তিনি বাহিরের সবই দেখিতেন। কখন কিরূপে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা বুঝিবার অবসর আমাদিগকে দেন নাই। তিনি সভায় মিশিতেন না, সমাজের সঙ্গ রাখিতেন না। শরীর অত্যন্ত স্থূল ছিল বলিয়া যৌবনেই তিনি কতকটা অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য আবশ্যক হইলেও অনেক সময়ে সমাজে বা সামাজিক কার্য্যে যোগ দিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার যে কোন গ্রন্থ পড়িলেই মনে হয়, তিনি নাট্যমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে থাকিতেন, আর কখন কোন ফাঁক দিয়া দর্শকমণ্ডলীর চরিত্র চর্চ্চা করিয়া লইতেন। তাঁহার 'বাঙ্গালী চরিতে' ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কোন্ ভাক্ত ভণ্ড কোন্ সমাজের কোন্ অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া ভণ্ডামীর প্রকট লীলা করিতেছে, তাহার প্রস্ফুট ছবি দেখিতে হইলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের "বাঙ্গালীচরিত" পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি বাঙ্গালীচরিতে ভণ্ড বাঙ্গালীর মুখোশ খুলিয়া দিয়াছেন। গদ্যে পদ্যে, ব্যঙ্গে রঙ্গে, শ্লেষে বিদ্রূপে ভণ্ডচরিত্রের এরূপ বিকাশ বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

ব্যঙ্গের ভাষা যোগেন্দ্রচন্দ্রের সকল গ্রন্থেই পরিস্ফুট। ইহা পদ্যেও যেরূপ, গদ্যেও সেইরূপ। আবার গ্রন্থেও যেমন, প্রবন্ধেও তেমনই। আবার গাম্ভীর্য্যের ভাষাও ঠিক এইরূপই। ফল কথা, ভাষা যেন তাঁহার দাসী; তাহাকে যখন যে দিকে চালাইয়াছেন, সে ঠিক সেই দিকেই সমভাবে চলিয়াছে। একই জলধারা কখন

ভীমাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া উদ্দাম গতিতে তরঙ্গ-ভঙ্গে ছুটিয়াছে, আবার কখন বা শান্তা সুধীরা বালিকাটীর মত মৃদুভাবে মৃদু উর্ম্মিমালা তুলিয়া ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। চুণ, শুরকী, বালি, ইট, এই কয়েকটী যেমন সৌধসৃষ্টির প্রধান উপকরণ, তেমনই করুণ, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র ও শান্ত এই কয়েকটী রসই গাম্ভীর্য্যসৃষ্টির উপাদান। এই কয়টী রসের যথাযথ প্রয়োগে গাম্ভীর্য্য-সৃষ্টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। "রাজলক্ষ্মী" এবং "মডেলভগিনী" হইতে গাম্ভীর্য্যসৃষ্টির বহু উদাহরণ উদ্ধৃত হইতে পারে। "মডেলভগিনী"র ব্রাহ্মণ রাধাশ্যাম, "রাজলক্ষ্মী"র সাধ্বী বিধবা কাত্যায়নী, পুত্রবধূ যশোদা, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীপ্রসাদ, ভৃত্য মধুদয়াল, দীনদয়াল, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি গাম্ভীর্য্যসৃষ্টির সজীব বিগ্রহ।

পুণ্যচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, আগে পাপের চিত্র দেখিতে হইবে; আগে অন্ধকার না দেখিলে আলোকের সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। এই জন্য সকল ভাষায় সকল কাব্যে পাপপুণ্যের চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত হয়। তাহাতেই কাব্যের কৃতিত্ব-রাগ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। একদিকে যেমন পাপের ঘনকালিমাময় বিকট চিত্র, অন্যদিকে তেমনই পুণ্যের সৌরকরোজ্জ্বল ভাস্বর মহিমময় চিত্র। অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক, দুঃখের পার্শ্বে সুখ, রাত্রির পার্শ্বে দিবা, শোকের পার্শ্বে সান্ত্বনা। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে ঠিক এমনই করিয়া, পাপ ও পুণ্যের চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার "মডেলভগিনী"তে পাপপথচারিণী বিলাসিনী কুলকলঙ্কিনী কমলিনীর, এবং "রাজলক্ষ্মী"তে ভণ্ড কাশীবাসী, সনাতন, শিয়ালমারা প্রভৃতি পাপচিত্রের পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি। অপর দিকে মডেলভগিনীর রাধাশ্যাম এবং রাজলক্ষ্মীর কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা, মধুদয়াল, পুণ্যচিত্রের আদর্শস্বরূপ। কাত্যায়নী ও অন্নপূর্ণার

চরিত্রে করুণ রস, প্রভুভক্ত মধুসূদনের চিত্রে বীর রস, ধার্ম্মিক ভক্ত রাধাশ্যাম ও দীনদয়ালের চিত্রে শান্ত রস, আর কমনীয় কিশলয়সম কিশোরী রাজলক্ষ্মীর চিত্রে রৌদ্র রসের যে পরিচয় পাই, প্রকৃতই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা বাঞ্ছনীয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী উপন্যাস সত্য সত্যই যেন নব রসের পূর্ণাধার। কাশীতে ভণ্ড ভক্তে যোগেন্দ্রচন্দ্র যে অদ্ভুত রসের অবতারণা করিয়াছেন, সেরূপ অদ্ভুত রসের বিকাশ আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক একটি দৃষ্টান্ত সহকারে এক একটী রসের বিশ্লেষণ অদ্য এই প্রবন্ধে অসম্ভব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শরতে বঙ্গের গৃহে গৃহে আমরা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-ময়ী দশভুজার মোহিনী মূর্ত্তিতে যে মধুর প্রখর ভাবোন্মাদ দেখিতে পাই, যোগেন্দ্রচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী উপন্যাসে চিত্রিত রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-চিত্রে সেই মধুর প্রখর ভাবোন্মাদ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত।

চরিত্র বা স্বভাবের বর্ণনায় সম-আলোকচ্ছায়া-সম্পাত বর্ণবিন্যাসে যোগেন্দ্রচন্দ্রের তুলিকা এমন আঁকিয়াছে যে, সে চিত্র দেখিলে মনে হয় যে, বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর গুইডো বা র‍্যাফেল চক্ষের সম্মুখে একখানি ছবি আঁকিয়া ধরিলেন। বর্ণনার ভাষায়, রসের বৈচিত্র্যে, ভাবের নূতনত্বে তাহা সর্ব্বজনমনোহর। তাঁহার ভাষাগাম্ভীর্য্যে সন্ধ্যার শান্ত-সৌম্য-গম্ভীর-মূর্ত্তি, আর রঙ্গে স্বচ্ছ-সরোবর-সলিল-প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমার ঢল ঢল ছায়া। তাহা গাম্ভীর্য্যে প্রশান্ত ঋষি-মণ্ডলী-সেবিত বিশুদ্ধ তপোবন, আর রঙ্গে বিলাসীর বিলাসরসপূর্ণ নর্ত্তকী-কল-কণ্ঠ মুখরিত প্রমোদকানন। সহজ অলঙ্কারে সহজ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, তাঁহার ভাষাগাম্ভীর্য্যে বৌমাষ্টারের যাত্রায় দলের ধ্রুবচরিত্রের সুনীতি, আর রঙ্গে গোপাল উড়ের

যাত্রার বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী। তাঁহার রঙ্গপূর্ণ ভাষার পরিচয় পূর্ব্বে অনেক পাইয়াছেন, এখন রাজলক্ষ্মী হইতে গাম্ভীর্য্যের একটু পরিচয় লউন।

অন্নপূর্ণা অন্নাভাবে পিতা ভবানীপ্রসাদের অন্নসত্রে ধান ভানিতেছেন। ভবানীপ্রসাদ জানেন না যে, তিনি তাঁহারই কন্যা। এইখানকার একটু বর্ণনা শুনুন;—

"রাজা অমরসিংহ ঢেঁকিশালার সম্মুখে আসিয়া কাঠের বেড়া ধরিয়া বহির্দ্দেশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি অনিমেষ-লোচনে অন্নপূর্ণার অপূর্ব্ব অলৌকিক মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার লাল টুকটুকে দক্ষিণ চরণখানি ঢেঁকির উপর স্থাপন করিয়া, ঈষৎ ভর দিতেছেন, আর ঢেঁকি অল্প ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। পায়ের ভর একটু কমাইতেছেন, আর ঢেঁকির মুষল সজোরে গিয়া চাউলের উপর পড়িতেছে। চালার তীরের সহিত আড়ভাগে একখণ্ড বাঁশ বাঁধা আছে। হস্ত দ্বারা সেই বাঁশ ধরিয়া, দেহভার কতকটা সেই বাঁশের উপর রাখিয়া, তিনি ধানভানা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। আর ঢেঁকির পার্শ্বে বসিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী জননী যশোদা, একান্তমনে কুলার দ্বারা চাল পাছড়াইতেছেন, আবর্জ্জনা উড়াইতেছেন এবং খুদ এক পাশে ও চাল এক পাশে রাখিতেছেন।

"রাজা অমরসিংহের দৃষ্টি কেবল অন্নপূর্ণার প্রতি এখন নিপতিত। ধানভানা উপলক্ষে অন্নপূর্ণা কখনও হেলিতেছেন, কখনও দুলিতে-ছেন, কখনও অবনতাঙ্গী হইতেছেন, কখনও যেন নতজানু হইবার উপক্রম করিতেছেন, কখন যেন বীর-রমণীর ন্যায় স্ফীত কলেবরে ঈষৎ ঊর্দ্ধপানে উঠিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল এবং বিস্তৃত নয়ন আজ আরও যেন অধিকতর উজ্জ্বল এবং বিস্তৃত দেখাই-

তেছে। লাল-লাল অধরপ্রান্তে মাঝে মাঝে মধুর-মধুর সাদা-সাদা হাসিফুল যেন আধ-আধ ফুটিয়া উঠিতেছে।

"অন্নপূর্ণার এই অপরূপ স্বর্গীয় রূপরাশি দেখিয়া, রাজা অমরসিংহ মোহিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন,—"তুমি কে মা? তুমি কাহার কন্যা? আধ-আধ হাসিয়া, মহাসমরে কেন নাচিতেছ? মা! আজ কি শুম্ভনিশুম্ভ-বধের দিন? বল মা! তুমি কে,—বামা? এরূপ এলোথেলো কেশে, এরূপ ছিন্ন-মলিনবেশে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব অঙ্গভঙ্গী করিয়া,—প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব রঙ্গ-তরঙ্গ দেখাইয়া,— সমরাঙ্গনে নাচিয়া নাচিয়া তালে তালে পা ফেলিতেছ? মা! তুমি কি ভবভয়হারিণী? তোমার নয়নদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে নাচে কেন মা? মা! এই যে শব্দ উত্থিত হইতেছে,—এ কি দৈত্যদল-বিনাশকালীন ঘোর গভীর হুহুঙ্কার শব্দ? হে জগৎপালিকে! নাচ, মা! নাচ;—জীবের জ্বালা যন্ত্রণা দূর কর মা!

"মাগো! আমার হৃদয়-মাঝারে আসিয়া একবার নাচ গো! তেমনি তেমনি করিয়া করতালি দিয়া, হাসি-জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আমার এই অর্দ্ধদগ্ধ মরুময় হৃদয়-মাঝারে আসিয়া একবার নাচ,—মা! মা! হৃদয় আমার পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। মা-গো! অমৃতবারি সেচন করিয়া, শান্তিজল ঢালিয়া, আমার এই হৃদয়ের আগুন, নাচিয়া নাচিয়া নিভাও মা!

"মা! তুই লাল-বরণী হইয়া, কালো রংএর কাপড় কেন পরিয়া আছিস্? নীলাম্বরে কি কখন অচঞ্চলা দেহ-সৌদামিনী ঢাকিয়া রাখা যায়? সত্য সত্যই মেঘ দিয়া, তুই কি পূর্ণিমার চাঁদখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিস্? অথবা মেঘাম্বর পরিধান করিয়া মেঘাম্বরে কটীতট বাঁধিয়া, মেঘের উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিলে—তোর নাচ বুঝি ভাল

দেখায় মা! তবে ঐ নীলবসন পরিয়া পরিয়াই অনন্তকাল ঐরূপ নাচিতে থাক্ মা!

"হে নীলকণ্ঠভূষণা! হে নীলপদ্মনয়না! হে নীলবসন-পরিধানা! একবার আমার অন্তরে আসিয়া নাচ মা! একবার আমার বাহিরে আসিয়া নাচ মা!—আমার অন্তরে-বাহিরে উভয় স্থানে নাচ মা!

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের বর্ণনায় আর এক বিশেষত্ব এই যে, কোন কোন স্থানের বর্ণনা তাঁহার নিজের বিরাট বপুবৎ বিরাট হইলেও বিকট নহে; বিরক্তিকর তো নহেই। পরন্তু তাহা পাঠকের আগ্রহজনক। এখানে তাঁহার রচিত "কালাচাঁদ" গ্রন্থে কালাচাঁদের ভূরি-ভোজন উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে বিংশতি পৃষ্ঠাব্যাপী ভূরি ভোজনের বিবরণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইবার অবসর এক্ষণে নাই। সুতরাং শ্রোতৃ-বৃন্দকে উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম। সে ভূরি ভোজনের ব্যাপার পড়িতে বিরক্তি তো হয়ই না, পরন্তু অতি ক্ষুধার্ত্ত পাঠকেরও যেন একটা ক্ষুন্নিবৃত্তির সুখানুভূতি আসিয়া পড়ে। সহজ কথায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিরাট বর্ণনা যেন ময়রার দোকানের লেডিকেনি—উপরে খট্‌খটে, ভিতরে রসে ভরা।

চাঁদ কেমন করিয়া সমুদ্রের জল বাড়ায়, তাহা কেহ জানে না; কিন্তু চাঁদের কিরণে সমুদ্রের জল বাড়ে, ইহা সত্য। যোগেন্দ্রচন্দ্র কেমন করিয়া সাহিত্যের সেবা করিতেন, তাহা হয় তো অনেকেই জানেন না, কিন্তু তাঁহার সেবায় যে সাহিত্য সম্পুষ্ট, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার সাহিত্য-সেবার প্রক্রিয়া দেখি নাই—প্রভাব বুঝিয়াছি।

মানুষ অলক্ষ্যে অন্তরালে থাকিলেও তাহার ছায়া দর্পণে পড়িলে যেমন তাহার আকৃতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়, তেমনই

যোগেন্দ্রচন্দ্র সমাজ হইতে দূরে থাকিলেও তাঁহার সাহিত্যে, তাঁহার চরিত্রের ছায়া পরিদৃষ্ট হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র স্বরচিত "রাজলক্ষ্মী" উপন্যাসে রূপান্তরে দীনদয়াল। দীনদয়াল যৌবনে দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে নিত্য ব্যথিত অন্তঃকরণে মাথায় সামান্য মাত্র দ্রব্যসম্ভার লইয়া পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ধার্ম্মিক সত্য-পরায়ণ; ব্যবসায়ে অসত্যাচরণে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত, দীন-দয়ালের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তিনি যখন পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়াইতেন, তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, কখন কাহাকেও কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিব না, এক দর ভিন্ন দুই দর বলিব না। ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক। প্রথম প্রথম সত্যপরায়ণ দীনদয়াল ব্যবসায়ে নিষ্ফল হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম সত্যপরায়ণ দীনদয়ালের কথা লোকে অসত্য ভাবিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও দীনদয়াল সত্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। সত্যের অপার মহিমায় দীনদয়াল কালে ব্যবসায়ে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। জীবনে কত কোটি টাকা উপার্জ্জন করিলেন। তিনি অনন্ত দয়ার সাগর—উপার্জ্জিত অর্থ মুক্তহস্তে দীন দরিদ্রে বিতরণ করিতেন। তিনি নামের ভিখারী ছিলেন না। উপযাচিত হইয়াও তিনি উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি আপনাকে লুকাইয়া দান করিতেন, কিন্তু পরকে দেখাইবার জন্য উপাধি লইতেন না। অনুচর, কিঙ্কর, আত্মীয় স্বজন, পরিচিত, সকলের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। তিনি পুরুষকারের পূর্ণ অব-তার ছিলেন।

এই দীনদয়ালের চরিত্র যতই আমরা আলোচনা করি, ততই যোগেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্র আমাদের নিকট প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি নিজে "বঙ্গবাসী"র বিজ্ঞা-পনপত্রিকা বিতরণ করিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হইলে পর,

তিনি এক দরেই বিজ্ঞাপন লইতেন। তাঁহার দর বাঁধা ছিল। কাহা-রও নিকট কম বা কাহারও নিকট বেশী দর কিছুতেই লইতেন না। ইহাতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইয়াছিল, বঙ্গবাসীতে বড় বেশী বিজ্ঞাপন আসে নাই। কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। তিনি বলিতেন,—"এক জনের নিকট এক দর ও অন্য জনের নিকট আর এক দর লইলে প্রবঞ্চনা করা হয়। বঙ্গবাসী থাকুক বা না থাকুক এরূপ প্রবঞ্চনা করিব না।" পরে কিন্তু আর "বঙ্গবাসী"তে বিজ্ঞাপনের অভাব হয় নাই। এই নীতিতে তিনি এ পর্য্যন্ত "বঙ্গবাসী" চালাইয়া আসিতেছিলেন। নিজের অধ্যবসায়ে নিজের সাধুতায় তিনি দীনদয়ালের মত অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার দীনদয়ালের মত পরার্থে অনেক অর্থ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। দীনদয়ালের মত তিনি উপাধিকে উপেক্ষা করিতেন। অনেক বারই তাঁহার উপাধি পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগে তিনি আত্মহারা হন নাই। যাহা তাঁহার দৃষ্টিতে উপেক্ষণীয়, তাহা দেববাঞ্ছিত হইলেও তিনি তাহাকে আবর্জ্জনা জ্ঞানে বর্জ্জন করিতেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে নির্জ্জনতারই নিদর্শন দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্য রঘুদয়াল, ভ্রাতৃভক্ত রমাপ্রসাদ, সতীশিরোমণি যশোদা, আবার অন্যদিকে শিয়ালমারা, সনাতন, কাশীবাসী, মডেল ভগিনীর পাপময়ী কমলিনী, নগেন্দ্র, কপিল খানসামা প্রভৃতির চিত্র-গুলি তাঁহার দৃষ্টির অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিয়া দেয়। এই সকল চিত্র দেখিলে মনে হয়, যোগেন্দ্রচন্দ্র স্থূল দেহে স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিলেও যেন তাঁহার কোন্ অতি সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বঙ্গের বিরাট সমাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া, প্রত্যেক লোক-চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের নিখুঁত ফটো তুলিয়া লইত। সাহিত্যে, চরিত্রে, বা ভাষায় রঙ্গে এবং গাম্ভীর্য্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের ছায়াই দেখিতে পাই।

কার্য্যক্ষেত্রে তিনি গুরু গম্ভীর, কার্য্যের বাহিরে সখ্যসুখালাপে তিনি রসাবতার। কার্য্যে দার্শনিক, সখ্যে কবি। কমলসরোবরের তটস্থিত ঘন কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজি দর্শনে যাঁহারা অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহরা যেমন সেই সরোবরের কমলসৌন্দর্য্যের দর্শন-সুখানুভবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ যাঁহারা দূর হইতে তাঁহার ঘনমসীবর্ণ স্থূল দেহের গাম্ভীর্য্যটুকুর আভাস পাইয়া তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সাহসী হইতেন না, তাঁহারা তাঁহার রসানুভবে বঞ্চিত হইতেন।

সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রভাব কিরূপ, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ফল কথা, যোগেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে সুনিপুণ সূপকার। একদিকে সাহিত্যের পোলাও, কোপ্তা, কাবাব পায়েস, পিষ্টক প্রভৃতির পাকে তিনি যেরূপ সিদ্ধহস্ত, অপর দিকে শুক্ত, ঝোল, ডাল, অম্বলের পাকেও তেমনই পটু। তিনি পোলাওর আকনীর জল কখনও আঁকাইয়া ফেলেন নাই এবং শুক্ত'র ঝোলে কখনও নুণ-ঝাল বেশী করেন নাই। যিনি পাকা অভিনেতা, তিনি রাজা সাজিয়া যেরূপ বাহাদুরী লন, আবার ভৃত্য সাজিয়াও সেইরূপ বাহাদুরী লইতে পারেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বড় বড় উপন্যাস লিখিয়া যেমন প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তেমনই সংবাদপত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিয়াও বাহবা পাইয়াছেন। এরূপ সৌভাগ্যশালী সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবক বাঙ্গালায় বিরল।

সমাজে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার "বঙ্গবাসী" তাঁহার প্রকাশিত সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশ, এবং বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্য গ্রন্থাদির প্রচারে বঙ্গে হিন্দু সমাজের বিপ্লবের গতিরোধের পক্ষের কতটা সহায়তা করিয়াছে, তাহা বোধ হয় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের

মধ্যে কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভূমিতে হিন্দুসমাজ কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং এখনই বা তাহার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলেই যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের প্রভাব বেশ বুঝা যাইবে।

বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, এখনও কোন ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুসন্তান টীকি রাখিলে এবং গলায় মালা পরিলে কাহারও কাহারও নিকট 'বঙ্গবাসীর চেলা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, যোগেন্দ্র-চন্দ্রের 'বঙ্গবাসী' ও সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশ বঙ্গের হিন্দুসমাজে লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মভাব আবার জাগাইয়া তুলিয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের ন্যায় নব্যবঙ্গে বোধ হয় আর কাহারও সাহিত্য এরূপ ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। বিলুপ্তপ্রায় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও সুলভপ্রচার করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র হিন্দুসমাজের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুসমাজ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আজি আমরা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া এত নাড়া-চাড়া করিতেছি এবং প্রতি কথায় শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি, একদিন এই সকল গ্রন্থের এক একখানি পৃষ্ঠার জন্য কত লোককে প্রাণপাত করিতে হইয়াছে; প্রাণান্ত পরিশ্রমেও হয়তো সকলের অদৃষ্টে উহার দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। সেই শাস্ত্রগ্রন্থরাজি আজি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কে বিলাইল?—যোগেন্দ্রচন্দ্র। এই সকল মহামূল্য লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিয়া কে আমাদের আর্য্য শাস্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিল?—যোগেন্দ্র-চন্দ্র। প্রাণান্ত পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায়, অবিচল সহিষ্ণুতার ফলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশের প্রচার।

প্রাচীন কাব্যাদি প্রকাশে যোগেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবীদিগের হৃদয়ে প্রাচীন সাহিত্যের মর্ম্ম ও মাহাত্ম্য যেরূপ প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ কি আর কেহ পারিয়াছেন? প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিষ্ঠাশক্তির পরিচয় প্রস্ফুটনে বহু-বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীকে প্রাচীন লেখকদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের গৌরব সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি পাঠ্যাবস্থায় প্রাচীন কবিদিগের কাব্যালোচনায় তাঁহাদিগের শক্তি-মাহাত্ম্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। কর্ম্মজীবনে তিনি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদির প্রচার করিয়া আপনার ন্যায় অনেক সাহিত্যসেবীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সহবাসসম্মতির আইন সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সময় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ প্রবন্ধে তাহার সবিস্তার আলোচনা অনাবশ্যক। কেননা, তাহা ভারতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং উহা চিরদিনই তাঁহার সাহিত্য-প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিবে।

বাঙ্গালার পাঠকের উপর যোগেন্দ্রচন্দ্রের কিরূপ প্রভাব, তাঁহার লিখিত বিজ্ঞাপনের লিপি-পটুতাতেই তাহা পূর্ণ প্রমাণিত। সমাজকে বুঝাইতে, মজাইতে, তাঁহার সাহিত্য মোহময়ী মদিরার তীব্র-মধুর ধারা সমাজের শিরায় শিরায় ঢালিয়া দিত। সংবাদপত্রে লেখনী চালনায় সূত্রপাতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের যে সাহিত্য প্রখর প্রভাবে দীপক রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার পরলোকগমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা তেমনই ভাবে প্রজ্বলিত ছিল।

যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রথমে "সাধারণী"তে লিখিতে আরম্ভ করেন। কোন একটী গ্রামের লোক একটী রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য কর্তৃ-পক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু পুনঃপুনঃ আবেদনেও

কোন ফল হয় নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই রাস্তা সম্বন্ধে 'সাধারণী'তে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের ফলে দুই এক বৎসরের মধ্যে রাস্তাটী প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালা সংবাদপত্রে কোন বিষয় লিখিলে তাহার ফল হয় না। কিন্তু ধন্য যোগি! লিখিতে জানিলে এবং লিখিতে পারিলে ফল হয়।" কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়েই তাঁহার এইরূপ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গের বহু বাগ্মী কলরবসহকারে যাহা করণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র নীরবে সাহিত্যের সাধনায় তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। ২০ বিশ বৎসরের কলরব বিফল হইয়াছে, যোগেন্দ্রচন্দ্র ২৫ বৎসরের নীরব সাহিত্যসাধনায় সফল করিয়া তুলিয়াছেন। কলরবে কাজ হয় না, বরং অনেক সময় দেখা যায়, যাহারা কলরবে সমধিক পটু, তাহারা কার্য্যে অক্ষম। বসন্তের কোকিল পঞ্চমের কুহুতানে বিশ্ব বিমোহিত করিতে পারে, কিন্তু আপনার সন্তানগুলিকে পালন করিতে পারে না। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের জাপ্য মন্ত্র,—কথা ছাড়, কাজ কর। স্বর্গারোহণের এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদককে লিখিয়াছেন,—"বঙ্গবাসী" বরাবর বলিয়া আসিতেছে, 'কথা ছাড় কাজ কর,—এখনও বলিবে। ইহাতে যদি দোষ হয়, তবে 'বঙ্গবাসী' এরূপ দোষযুক্ত চিরকাল থাকুক।"

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যে যে এত প্রতিষ্ঠা, আমাদের মনে হয়, তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধির প্রখরতা ইহার একটা প্রধান কারণ। তিনি সাহিত্যকে প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের লক্ষ্যস্থল করিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে "সুলভ সমাচার", সুলভ সংবাদপত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। সুলভ সংবাদপত্র "বঙ্গ-

বাসী” আজ ২৫ বৎসর কাল পূর্ণপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। যোগেন্দ্রচন্দ্রের অপূর্ব্ব ব্যবসায়বুদ্ধিবলেই ‘বঙ্গবাসী’ বঙ্গের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্ররূপে পরিচিত হইয়াছে। ‘বঙ্গবাসী’র উপহারে তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধির প্রখরতার আরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখনও বুঝিতে পারি না, তিনি কিরূপে বৃহৎ বৃহৎ শাস্ত্রগ্রন্থ এত অল্প মূল্যে দিতেন। কোন কোন অগাধ-ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যোগেন্দ্র-চন্দ্রের এই সুলভ সংবাদপত্র ও শাস্ত্রপ্রকাশের ব্যবসায়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ধন্য ব্যবসায় বুদ্ধি! আবার ইহাও জানি, তিনি লাভের আশায় শাস্ত্রপ্রকাশ বাহির করেন নাই, দেশে শাস্ত্রগ্রন্থের বহুল প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; তিনি বলিতেন,—‘আমি যে মূল্যে শাস্ত্রগ্রন্থ বিক্রয় করিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ মূল্য বাড়াইলে আমার লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের লোক সে মূল্য দিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে পারিবে না। আমার লাভ না হউক, লোকসান না হইলেই মঙ্গল। আমার লোকসান হয় না, অথচ দেশের লোক শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়িতে পায়, ইহাই আমার লাভ—ইহাই আমার আনন্দ।” শাস্ত্র-গ্রন্থের সুলভ মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তাঁহার কথায় সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকে না। যোগেন্দ্রচন্দ্র সখের সাহিত্যসেবী ছিলেন না; তিনি জানিতেন, সখের যাত্রায় লোকশিক্ষার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহা স্থায়ী হয় না। পেশাদারী যাত্রা লোকশিক্ষাকর এবং স্থায়ী। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার এই ধারণা ছিল। এই ধারণায় তিনি আজীবন সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসেবার ফলে বঙ্গদেশে এবং বঙ্গীয় সমাজে যাহা হইয়াছে, তাহা আর কেহ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

সাহিত্য, চরিত্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম,—যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন,

যোগেন্দ্রচন্দ্রের অসাধারণত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসাধারণ পুরুষের অভাব আমরা এখনও সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যতই দিন যাইবে, ততই আমরা তাঁহার অভাবজনিত দুঃখ অনুভব করিতে পারিব। তখন সেই অভাবের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মর্ম্মে তীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিবে। তখন সেই কর্ম্মবীর সাহিত্যরথীর স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইবে। ভীষণ জলকষ্টের দিনে যেমন শুষ্কপ্রায় বিশাল দীর্ঘিকার স্বচ্ছ শীতল জলরাশির মধুর স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তেমনই এক-দিন সত্যসত্যই আমাদিগকে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অভাব অনুভব করিতে হইবে। তবে, অভাবের সঙ্গে মানুষের লুপ্ত পুরুষকার উদ্দীপিত হইয়া থাকে। জলের অভাবে গ্রামবাসীদিগের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়, যোগেন্দ্রচন্দ্রের অভাবে বঙ্গ-সমাজে সাহিত্য-সেবক কর্ম্মবীরের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে; ইহাই আমাদের একটা আশ্বাসের বিষয়।

আজি আর সেই কর্ম্মবীর যোগেন্দ্রচন্দ্র ইহলোকে নাই!—সংসারে কেই বা চিরদিন্ থাকে?—আজি শুধু যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি আছে। এই স্মৃতিই এখন আমাদের সম্বল; এই স্মৃতির পূজাই এখন আমা-দের করণীয় কার্য্য। আসুন, সকলে আমরা এখন সেই মহিমময়ী স্মৃতিকে হৃদয়ে বসাইয়া তাহার পাদমূলে শ্রদ্ধার উপহার ঢালিয়া দিই; আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া সমাজে শত শত যোগেন্দ্রচন্দ্রের সৃষ্টি করুক, সংসারে তেমনই শত শত কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হউক, তাঁহাদের পূত পাদস্পর্শে বঙ্গসমাজ ধন্য—চির-গৌরবান্বিত হউক।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

("মানসী" হইতে উদ্ধৃত)

অধ্যবসায়ী ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মপথে থাকিয়াও কর্ম্ম-জীবনে যে অনায়াসেই অভীষ্টরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন,—যোগেন্দ্র চন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্তে তাহারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রকটিত। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সকল ত্রুটির সংশোধন করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন করাই যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কর্ম্মবীর যোগেন্দ্রচন্দ্র অধ্যবসায়-গুণে—কেবল ধর্ম্ম-পথ ধরিয়াই—আপনার এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যে সম্যক্ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের প্রতিদিনের ঘটনাদ্বারা প্রমাণিত করিতে পারা যায়। ১২৬১ সালের ১৬ই পৌষ তারিখে (ইংরেজি ১৮৫৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে) বর্দ্ধমান জেলার ইলসারা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। দামোদর-তীরবর্ত্তী বেড়ুগ্রাম তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি।

হুগলিকলেজসংশ্লিষ্ট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, যোগেন্দ্রচন্দ্র হুগলিকলেজেই এফ এ পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দীপ্তির মোহিনী আশা উচ্চমনা যোগেন্দ্রচন্দ্রকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই; তিনি কলেজ ছাড়িয়া শীঘ্রই আপনার গন্তব্য পথ বাছিয়া লয়েন,—তিনি চুঁচুড়ায় "সাধারণী" সংবাদপত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে বঙ্গের বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট সংবাদপত্র-সম্পাদন-কার্য্য শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।

শিক্ষানবিশী শেষ করিয়া কিছুদিন পরেই যোগেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতায়

আসিলেন। "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হইল। ১২৮৮ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী স্মরণীয় দিন, এই দিনেই "বঙ্গবাসী"র জন্ম। উদ্যোগী পুরুষসিংহ যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিচালনায় দিন দিন "বঙ্গবাসী"র শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অচিরেই "বঙ্গবাসী"র প্রচার বাড়িল, প্রভাব বাড়িল, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তদানীন্তন বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি ক্রমেই যেন নির্জীব হইয়া আসিতেছিল,—অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় দিন দিনই শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া পড়িতেছিল, যোগেন্দ্রচন্দ্র পাশ্চাত্য আদর্শে, কিন্তু দেশীয় ভাবে, দেশীয় ধাতুতে পরিপাক হইবার মত উপায়ে আহার্য্য দিয়া "বঙ্গবাসী"কে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। তাঁহার আদর্শে অপরাপর সংবাদপত্রেও সজীবতা দেখা দিল; তাহাদের নিস্তেজ ধমনীসমূহে পুনরায় রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল,—বাঙ্গালা সংবাদপত্রে এক নূতন যুগ আসিয়া পড়িল। ধর্ম্মপ্রাণ যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্কল্প অনুযায়ী "বঙ্গবাসী" শীঘ্রই হিন্দু সমাজের মুখপত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিল; সর্ব্বত্রই "বঙ্গবাসী"র সুখ্যাতি রটিল। সাহেব সিবিলিয়নেরাও ইহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত সিবিলিয়ান মিঃ লিলি বলিয়াছিলেন,—"যতগুলি বাঙ্গালা সংবাদপত্র আছে তাহাদের মধ্যে "বঙ্গবাসী"রই প্রতিপত্তি এবং প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।" হিন্দু সমাজে "বঙ্গবাসী"র প্রভাব কত অধিক, সহবাস সম্মতি বিধির প্রবর্ত্তন সময়েই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। "বঙ্গবাসী"র ইঙ্গিত অনুসারেই লক্ষ লক্ষ লোক এই আইনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। সেই আন্দোলনের ফলেই "বঙ্গবাসী"র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল,—যোগেন্দ্রচন্দ্র রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করায় অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র একখানি বাঙ্গালা দৈনিকপত্রও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দশবৎসর-কাল এই পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র "বঙ্গবাসী"র একটি হিন্দি সংস্করণও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন,—ইহা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত "হিন্দী বঙ্গবাসী"; এই পত্র এখন ভারতের সর্ব্বত্র বহুলরূপে প্রচারিত। এই পত্র দ্বারাই হিন্দীভাষী জনগণের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতিভা, মেধা, বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই পত্র দ্বারাই হিন্দীভাষী জনগণের মধ্যে 'লোকমত' গঠিত হইল, দেশহিতকর ব্যাপারে একতার প্রয়োজনীয়তা প্রচারিত ও তাহার বীজ উপ্ত হইল।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের অপর অনুষ্ঠান,—"টেলিগ্রাফ" নামক দৈনিক ইংরেজি সান্ধ্যপত্রিকার প্রতিষ্ঠা। এদেশের ইংরেজি সান্ধ্যপত্রিকাগুলির মধ্যে "টেলিগ্রাফ" সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; মূল্য মাত্র এক পয়সা, এ কারণে অল্পকাল মধ্যেই "টেলিগ্রাফ" লোকপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু এক পয়সা মূল্যের ইংরেজি দৈনিক পত্র চলিবার মত সময় এখনও এদেশে আসে নাই; সুতরাং যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে "টেলিগ্রাফ" সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

মূল সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং হিন্দী ভাষায় প্রায় সমুদায় শাস্ত্রগ্রন্থই প্রকাশিত করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই অমূল্য গ্রন্থনিচয়ের মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র যে অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের বহু অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র নিজেও একজন কৃতী গ্রন্থকার ছিলেন। গ্রন্থকার হিসাবেও তাঁহার আসন কত উচ্চে,—'রাজলক্ষ্মী', 'মডেলভগিনী'

প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসসমূহের পাঠকবর্গকে তাহা বুঝাইতে হইবে না।

কার্য্যপরিচালনা-বিষয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। কর্ম্মচারিবহুল বিরাট আপিসের সমুদায় কর্ম্মই একা যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যবস্থানির্দ্দেশে সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হইত। ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁহার অতীব তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যখন যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহার কোনটীতে নিষ্ফল বা ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। ছাপাখানা, পুস্তকপ্রকাশ, সংবাদপত্রপরিচালন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার আদর্শই আজকাল সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতেছে। কাজ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল এবং সেই ক্ষমতায় তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব ও শিক্ষাপ্রদ।

স্বগ্রামে যোগেন্দ্রচন্দ্র সাধারণের বড়ই প্রিয় ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। যোগেন্দ্রচন্দ্র স্বগ্রামের প্রচুর উন্নতি ও স্বজাতির প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন,—বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন, বাজার বসাইয়াছেন, বাঁধ বাঁধাইয়া দিয়াছেন, পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন। ১৩১২ সালের ২রা ভাদ্র (ইংরাজি ১৯০৫ সালের ১৮ই আগষ্ট) তারিখে যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ; তাঁহার গুণ অশেষ ; কীর্ত্তি অসাধারণ।

গত (১৩১৬ সালের) ১১ই ভাদ্র শুক্রবারে তাঁহার স্মরণার্থ 'কোহিনুর থিয়েটারে' বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজ স্যার্ প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর মহোদয় সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বল্প কথায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের গুণ-গরিমার যে আদর করিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মহারাজ বলেন,—"অদ্যকার সভায় কার্য্যপরিচালনের ভার আমাকে দিয়াছেন, সে জন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যাহাতে পরলোকগত

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অসাধারণ গুণগ্রামের স্মৃতি সাধারণের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, সেই উদ্দেশ্যে "সাহিত্য-সম্মিলন" বৎসর বৎসর একটি সভার আহ্বান করেন। আজ সেই বাৎসরিক সভার পঞ্চম অধিবেশন। যোগেন্দ্রচন্দ্র নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। "বঙ্গবাসী", "হিন্দী বঙ্গবাসী" ও "টেলিগ্রাফ" পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেশানুরাগের সম্যক্ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। "শাস্ত্রপ্রকাশ" অনুষ্ঠান তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের উদ্ধার, দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের সুলভ মূল্যে প্রচার এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন তাঁহার সাহিত্যানুরাগের ঘোষণা করিতেছে। তীব্র ব্যঙ্গ প্রয়োগে তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, গুরুগম্ভীর রচনায়ও তাঁহার তেমনই প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি ত' সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেনই; পরন্তু তিনি লক্ষ্মীরও বরপুত্র ছিলেন। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—বাস্তবিকই তিনি উদ্যোগী পুরুষসিংহের আদর্শ ছিলেন। তিনি সকল সৎকর্ম্মে সর্ব্বদা প্রস্তুত, উৎসাহী এবং সাহসী ছিলেন। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার সমর্থন করিতেন। তিনি বুঝিতেন, বিরুদ্ধবাদ না থাকিলে কোন বিষয়েরই জীবনীশক্তি থাকে না, কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না, কোন বিষয়েরই সত্য নির্ণীত হয় না। তবে সুখের কথা এই যে, তিনি যেগুলি ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সে গুলির অধিকাংশ বাস্তবিকই দেশের ও সমাজের হিতকর হইত। তাঁহার ধারণায় প্রায়ই ভুল হইত না। তিনি অনেক স্থলে বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়া কেবল যে বাহাদুরীই করিতেন, তাহা নহে, তথ্য নির্ণয়ে তাঁহার প্রকৃত যত্ন থাকিত। তিনি কর্ম্মচারিগণের প্রতি ক্ষমাশীল, দয়াশীল ও স্নেহশীল প্রভু ছিলেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতার বহু প্রমাণ,—তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রমাণ, তাঁহার বহু কার্য্যে

দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার দেহত্যাগে সমাজ ও সাহিত্য যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেই হইবে। সুখের বিষয়, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু, পিতৃকীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত আছেন।"

গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।*

(শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত "সরল বাঙ্গালা অভিধান" হইতে উদ্ধৃত)

চিনিবাস চরিতামৃত।

বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক নব্য যুবক নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং কয়েকজন যুবক ও কয়েকজন রমণীকে লইয়া একটী দল বাঁধিয়া ভারত-উদ্ধারার্থ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শেষে গবরমেণ্টের নিকট তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এদিকে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সূতা কাটিয়া দিনপাত করেন, এবং পুত্রকে দেখিবার জন্য অস্থির হন। কিন্তু চিনিবাস তাঁহাকে মাতা বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহার মাতা নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন।

---

* স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সরল বাঙ্গালা অভিধানে দুইখানি গ্রন্থের পরিচয় ছাড় হইয়াছে; একখানি "কাঁচার্চাদ (উপন্যাস) আর অপর খানি "মহীরাবণের আত্মকথা (হাস্যরসাত্মক নক্সা)।

নেড়া হরিদাস।

বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। আজি কালি এক শ্রেণীর জুয়াচোর সাধু বৈষ্ণব সাজিয়া নিরীহ লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের উদর পূর্ত্তি করিতেছে। নেড়া-হরিদাস ঐ শ্রেণীর একজন পাকা জুয়াচোর বৈষ্ণব। জনৈক নিরীহ ব্রাহ্মণ তাহার ভণ্ডামীতে ভুলিয়া তাহাকে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ সাধু বৈষ্ণব বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট কিছু টাকা গচ্ছিত রাখেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ টাকা ফিরাইয়া চাহিলে হরিদাস তাঁহার অর্থ প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, কৌশলে তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হই-লেন। সেই সময়ে বৃন্দা নাম্নী এক সঙ্গতিশালিনী বিধবা ঐ ব্রাহ্মণের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। বৃন্দার চরিত্র বড় ভাল ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার দয়া, পরোপকার, দানশীলতা প্রভৃতি অন্য অনেক গুণ ছিল। হরিদাস মধ্যে মধ্যে বৃন্দার বাড়ী যাতায়াত করিতেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া বৃন্দার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি তাঁহাকে হরিদাসের কবল হইতে উদ্ধার করিবার এবং হরিদাসের নিকট তাঁহার যে গচ্ছিত টাকা ছিল, তাহাও পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিলেন।

ইতিমধ্যে বৃন্দার দেওয়ান তীর্থস্থানে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে দেওয়ানের মৃত্যু সংবাদ আসিল। তখন বৃন্দা তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লেখা পড়া করিয়া নেড়া-হরিদাসকে দান করিয়া নিভৃতে ধর্ম্ম চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৃন্দা ঐরূপ অভিলাষ প্রকাশ করায় হরিদাসের আন-ন্দের সীমা রহিল না। দানপত্র লেখা-পড়া হওয়ার জন্য সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল। একদিন উকীল ও অন্যান্য লোক

বৃন্দার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দানপত্র লেখা-পড়া হইতেছে, এমন সময়ে সেই নেড়া হরিদাস কর্ত্তৃক প্রতারিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জনৈক বলিষ্ঠদেহ যুবক সমভিব্যাহারে বৃন্দার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরিদাস দেখিলেন, এ সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া গোলযোগ করিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। এজন্য তিনি তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের টাকা ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই বুদ্ধিমতী বৃন্দার কৌশল।

এদিকে দানপত্র লেখাপড়া হইয়া সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে বৃদ্ধ দেওয়ান তীর্থভ্রমণ করিয়া সহসা আবির্ভূত হইলেন। বিশ্বস্ত দেওয়ানের মৃত্যু-সংবাদেই বৃন্দা আপনার বিষয়-সম্পত্তি হরিদাসকে দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেয়ানকে জীবিত ও প্রত্যাগত দেখিয়া বৃন্দা তাহাতে অস্বীকৃতা হইলেন। নেড়া হরিদাসও হতাশ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন, সমবেত জনগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে ও গালাগালি দিতে লাগিল; কারণ তাহাদের অনেককেই তিনি জুয়াচুরি করিয়া ঠকাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরেই হরিদাস সর্ব্বস্বান্ত হইলেন এবং অবশেষে সেই বৃদ্ধ দেওয়ানের আশ্রয়ে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। এ দিকে বৃন্দা তাঁহার পূর্ব্ব দুষ্কৃতিসমূহের নিমিত্ত—বিশেষতঃ নেড়া হরিদাসের ব্যাপারে—তিনি যে প্রকার নীতিবিগর্হিত অপকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি দেবসেবায় ও দানাদি লোকহিতকর কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়া এবং সেই বিশ্বস্ত দেওয়ানকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া নিজে বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই উপন্যাসখানি

নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন কোহিনুর থিয়েটারে, অভিনীত হয়।

মডেল ভগিনী।

বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। বিকৃত শিক্ষা দ্বারা মানবের কিরূপ অধঃপতন সাধিত হয়, এবং সমাজে কিরূপ অনর্থ উৎপাদন করে, পাপের ফল কিরূপ বিষময়, পুণ্যের পরিণাম কিরূপ সুখকর, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার নায়িকা কমলিনী ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং নব্য-শিক্ষিত ইংরেজি হাবভাবের অনুকরণপ্রিয় জনৈক ডেপুটীর কন্যা। কমলিনীর এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-গর্ব্বে এরূপ স্বামী তাঁহার মনোনীত হইল না, তিনি উপন্যাসের নায়িকা হইয়া তাঁহার শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পবিত্র প্রণয়ে মত্ত হইলেন। তাঁহার স্বামী শ্বশুরালয়ে আগমন করিলে, তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিলেন ও অখাদ্য খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরধ্যাননিমগ্ন ব্রাহ্মণ ঈশ্বর-কৃপায় তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ইহার পর ব্রাহ্মণ কাশী যাত্রা করিলেন। কৈলাস নামক জনৈক যুবক প্রথমে কমলিনীর প্রণয়-প্রত্যাশী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া সাহেব সাজিয়া বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। পথে গাড়ীতে কমলিনীর স্বামী ব্রাহ্মণের উপদেশে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়, এবং তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের বৃন্দাবন-ধামে অবস্থান কালে কমলিনীর সহচরগণ তাঁহাকে মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে ধৃত করাইয়া দিল। অনেক ক্লেশভোগের পর ব্রাহ্মণ শেষে মুক্তি পাইলেন। এ দিকে কমলিনীর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া

আসিল। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিলেন। নানাবিধ অত্যাচারে কমলিনী ভীষণ রোগে আক্রান্তা হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ একে একে সরিয়া গেলেন। শেষে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পচিয়া গেল। পাপের ফল ফলিল। তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে একবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হতভাগিনী স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তখন তিনি স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পরলোকে যাত্রা করিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ বনগমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঙ্গালী চরিত।

বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর বক্তৃতা কতদূর অসার, স্বদেশহিতৈষিতা কিরূপ মৌখিক ও বিড়ম্বনাপূর্ণ, কল্পনাপ্রিয় বঙ্গীয় যুবকের বিবাহ-রহস্য, ইত্যাদি বিষয় সমুহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলে হুগলি জেলার বিজন গ্রামে শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করিতেন। শঙ্করীপ্রসাদ প্রকৃত হিন্দু ও দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার বাটীতে ৺শঙ্করী দেবীর নিত্য সেবা ও দোল দুর্গোৎসবাদি সর্ব্বপ্রকার পূজা পার্ব্বণ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তিনি সাতিশয় দানশীল, আতিথ্যপরায়ণ ও পর-হিতৈষী ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও কাহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না। তাঁহার পত্নীর নাম কাত্যায়নী। তাঁহার দুইপুত্র,—জ্যেষ্ঠ ভবানী

প্রসাদ ও কনিষ্ঠ রমাপ্রসাদ। ভবানী প্রসাদের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম যশোদা। তাঁহার এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। দেখিতে অতি সুশ্রী হওয়ায় শঙ্করী প্রসাদ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন,—লক্ষ্মী। রমাপ্রসাদের বিবাহ হয় নাই। তদ্ভিন্ন শঙ্করীপ্রসাদের সংসারে রঘুদয়াল নামে এক গোয়ালা ভৃত্য ছিল। রঘুদয়ালের দেহে যেমন অসাধারণ বল, লাঠি খেলায় ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের পরিচালনে তেমনি অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তৎকালে দেশে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। তদ্ভিন্ন সে একজন অসাধারণ সাপের ওঝা ছিল। সর্পাঘাতে মৃত বলিয়া স্থিরীকৃত ও অন্যান্য ওঝাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে সে মন্ত্র ও ঔষধের প্রয়োগে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিত। এই রঘুদয়াল বহুকাল অতি বিশ্বস্তভাবে শঙ্করীপ্রসাদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। এজন্য শঙ্করীপ্রসাদ ও কাত্যায়নী তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতেন। আবার রঘুদয়ালও তাঁহাদিগকে জনকজননী তুল্য এবং ভবানীপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদকে কনিষ্ঠ সহোদরবৎ জ্ঞান করিত।

কালক্রমে শঙ্করীপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন রমাপ্রসাদের বয়স ১৩।১৪ বৎসর এবং লক্ষ্মীর বয়স ৪ বৎসর মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পরেই, তিনি পূর্ব্বে যাহাদের উপকার করিয়াছিলেন, সেই সকল আত্মীয়স্বজনই কুট কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত বেচিয়া লইল। তাঁহার সংসারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। ভবানীপ্রসাদ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া ও পরিবারবর্গের বিশেষতঃ স্নেহের পুত্তলী লক্ষ্মীর অনশন-ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইলেন। এই সময় প্রভুভক্ত উদারচরিত রঘুদয়ালের মহত্ত্ব আরও উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে অতি প্রত্যূষে গ্রামান্তরে যাইয়া

কাহারও বাড়ীতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কাটচেলান বা উপস্থিতমত অন্য কাজ করিয়া দিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহাই আনিয়া মৃত প্রভুর পরিজনবর্গের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিতে লাগিল। ওদিকে শঙ্করীপ্রসাদের আত্মীয়গণ কেবল তাঁহার বিষয় সম্পত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, তাঁহার বাড়ী খানিও আত্মসাৎ করিবার প্রয়াসী হইল। কিন্তু রঘুদয়াল থাকিতে বাড়ীর লোকদিগকে বহিষ্কৃত করা সহজ নয়। কাজেই অগ্রে রঘু-দয়ালকে বাড়ী হইতে অপসারিত করা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল। তাহারা এক কূট কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক রঘুদয়ালের নামে এক মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে থানার হাজতে পুরিল। এদিকে মধ্যাহ্ন অতীত হইলেও রঘুদয়াল আসিল না দেখিয়া কাত্যায়নী বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। এমন সময়ে কতকগুলি সন্ন্যাসী অতিথি আসিয়া কাত্যায়নীর নিকট আতিথ্য-সৎকার প্রার্থনা করিলেন। তখন কাত্যায়নী অনন্যোপায় হইয়া ৺লক্ষ্মীর ঝাঁপি হইতে সিন্দূর মাথান মোহরটি—যাহা তিনি দারুণ দুরবস্থায় পড়িয়াও ভাঙ্গান নাই, তাহাই এক্ষণে অতিথি বিমুখ হইলে পাপ সঞ্চার ও গৃহস্থের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া, রমাপ্রসাদকে দিয়া অতিথি সেবার ও আপনাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতে পাঠাইলেন। বালক রমাপ্রসাদ মোহর ভাঙ্গাইতে গিয়া মোহর চুরির মিথ্যা অভিযোগে পুলীশের হস্তে অর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি রঘুদয়ালের সহিত একই হাজতে থাকিতে পাইলেন। রাত্রিকালে রঘুদয়াল রমাপ্রসাদকে লইয়া হাজত হইতে পলায়ন করিয়া দেশত্যাগী হইল।

রঘুদয়ালের অনুপস্থিতির সুযোগে পূর্ব্বোক্ত দুষ্টাশয় আত্মীয়গণ শঙ্করীপ্রসাদের পরিজনবর্গকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বাড়ীটি দখল

করিয়া লইল। কাত্যায়নী দেবী তাঁহার পুত্রবধূ যশোদা ও পৌত্রী লক্ষ্মীকে লইয়া অকূলপাথারে ভাসিলেন,—এখন হইতে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে পথের ভিখারী হইলেন, তাঁহাদের মাথা গুঁজিবারও স্থান রহিল না। অতঃপর তাঁহারা ভিক্ষায়ে কোনওরূপে জীবন রক্ষা করিতে করিতে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীতেও তাঁহারা মহাবিপদে পতিত হইলেন। এবং যশোদা অতি কষ্টে আপনার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করিলেন।

ওদিকে ভবানীপ্রসাদ গৃহত্যাগ করিয়া বর্ণনাতীত ক্লেশপরম্পরা সহ্য করার পর, কাশীতে দীনদয়াল নামক জনৈক পশ্চিমে ধনী সওদাগরের সহিত মিলিত হন এবং আপনার অটুট অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম সাধুতার বলে দীনদয়ালের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমে তাঁহার কারবারের অংশী ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রাজা উপাধি পাইয়া 'রাজা অমরসিংহ' নামে পরিচিত হন। এইরূপে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া তিনি বিজনগ্রামে আপনার জননী প্রভৃতি পরিবার-বর্গের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু সে লোক তাঁহাদের কোনও অনুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেলে, তিনি তাঁহাদের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। যশোদার মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাহারই আরাধনা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে কাত্যায়নী পুত্রবধূ ও পৌত্রীসহ বারাণসীতে উপস্থিত হন, সে সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। রাজা অমরসিংহ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য একটি অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। অনাহারে যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কাত্যায়নী, যশোদা এবং লক্ষ্মীকে লইয়া সেই অন্নসত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখনও

তাঁহাদের ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট দুর্ভোগ নিঃশেষিত হয় নাই। সেই অন্নসত্রেও মাতা ও দুহিতা মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে নিযুক্ত হইয়া অমর সিংহের নিকট নীতা হইলেন। এদিকে রঘুদয়াল ও রমাপ্রসাদ ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করীপ্রসাদের পরিজনবর্গ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন।